যুগান্তর

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

১৪ শিক্ষা

শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বাংলাদেশ

শা ও য়া ল খা ন

আজ ৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। জাতিসংঘ এবং ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত সব উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে যথাযথ মর্যাদায় এ দিবসটি পালন করা হয়। বিশ্বজুড়ে নিরক্ষরমুক্ত সচেতন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ এ দিবসটি পালনের ডাক দেয়। প্রতি বছর এমনি একটি দিনে এ দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য— বিগত এক বছরে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণমূলক গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে নতুন মাত্রা সংযোজন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ, ব্যাপক জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, জনমনে জাগরণ সৃষ্টি এবং প্রেরণা জাগিয়ে দেয়া ও নতুন উদ্দীপনা নিয়ে সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। বাংলাদেশেও ১৯৯০ সাল থেকে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বিগত দুই-তিন বছরে সেই উৎসাহ-উদ্দীপনার বিকাশ ঘটেনি বলাই চলে। তবে এর কারণ কি অতিদ্রুত সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না ধস। বিষয়টা আলোচনাসাপেক্ষ।

প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হয় ১৯৬৭ সালে। দিবসটি উদযাপনের সূচনা হয়েছিল ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবী থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে। পৃথিবী থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গৃহীত এ প্রস্তাবে গরিব দেশগুলোর মানুষকে সাক্ষর করার জন্য আন্দোলন এবং প্রচার অভিযান চালানোর ওপর জোর দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইতালির রোমে নিরক্ষরতা সমস্যা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেও নিরক্ষরতা দূর করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। পরে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮-১৯ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কোর উদ্যোগে ইরানে ১২ দিনব্যাপী এক বিশ্বসাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় আরও দু'বছর পর ১৯৬৭ সালে।

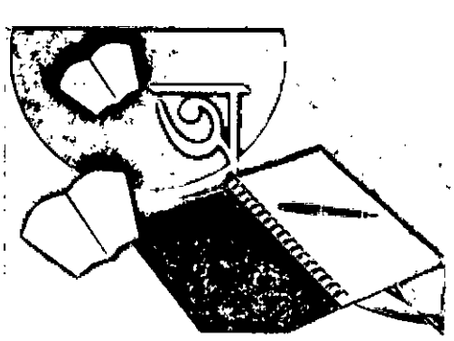

১৯৬৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তান, কুয়েত ও সিরিয়ায় ভোরে মসজিদে মসজিদে নামাজ শেষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। লাইবেরিয়াতে বিমান থেকে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। ইরান, মালি, সিরিয়া, কঙ্গো, তিউনিসিয়া, চিলি, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, লিবিয়া, আলজেরিয়া, গ্যাবন, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে স্মারক ডাকটিকিট ও বিশেষ খাম প্রকাশিত হয়। অনেক দেশে প্রবন্ধ, গান ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার প্রয়োজন করা হয়। উল্লিখিত দেশগুলোর প্রায় সব দেশেই সেদিন শোভাযাত্রা সহকারে দিবসটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। এছাড়াও সভা, সমাবেশ, নাটক, জারিগান ও লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে পুরো দিনটাকে উপভোগ্য করে তোলা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য মালি ও সুইজারল্যান্ড সেনেগালকে ছয়শ' রেডিও সেট উপহার দেয়। ইরান ও নেদারল্যান্ড ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েছিল একটি করে মুদ্রণ যন্ত্র। তানজানিয়ায় সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে দুই লাখ মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় আলজেরিয়া, ইকুয়েডর, গিনি, ভারত, ইরান, মালি, সুদান, সিরিয়া, ভোল্টা, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, চাদ, গ্যাবন, তেগো, উগান্ডা, আফগানিস্তান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও কেনিয়ায় এ দিন থেকে সাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয় ১৯৭২ সালে। পরের বছর এ দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান ঠাকুরগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম কচুবাড়ি কৃষ্টপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এ অনুষ্ঠান ঠাকুরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী এতে যোগ দেন। এ উপলক্ষে প্রথম গণশিক্ষাকর্মী সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। ১৯৭৪ সালে শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে কুমিল্লায় এ দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৭৭ সালে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, স্বনির্ভর বাংলাদেশের জাতীয় কমিটি, জাতীয় সমবায় পল্লী উন্নয়ন ফেডারেশন, জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি এবং সমবায় অধিদফতরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেয়। এরপর ১৯৭৮ থেকে '৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের উৎসাহে ভাটা পড়ে। ১৯৮১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি সফল গণশিক্ষা কর্মীদের ঠাকুরগাঁওয়ে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। কিন্তু ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে ১৯৮৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাক্ষরতা কর্মসূচি না থাকায় সাক্ষরতা দিবসের আবেদন তেমন গুরুত্ব পায়নি। পরে বিচ্ছিন্নভাবে সাক্ষরতা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হলেও তা ব্যাপক গণমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

১৯৯০ সালে 'সবার জন্য শিক্ষা' স্লোগানের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা বিষয়ক কার্যক্রম আবার গুরুত্ব পেতে শুরু করে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা'র বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু অধিকার বিষয়ক সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত নয়টি জনবহুল দেশে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে সাক্ষরতা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এ অঞ্চলের সাক্ষরতা উদ্যোগের ইতিহাস বেশ পুরনো। তবে সেটা কোন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল না। সর্বপ্রথম ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯২৬ সালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১২টি থানায় ১৫০টির মতো নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়। এ ব্যবস্থা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ সালে মি. বিভার নামে একজন বিদেশী ঢাকায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। নব্যসাক্ষরদের জন্য তিনি ২৪টির মতো বইও লেখেন। চার বছরের মধ্যে তিনি প্রায় দশ হাজার লোককে সাক্ষর করে তোলেন। ১৯৬৩ সালে কুমিল্লা 'বাড' কুমিল্লার আশপাশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এই কর্মসূচি সফল হয়নি। বিগত দিনগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, রাজনৈতিক অঙ্গীকারবিহীন এসব উদ্যোগ সংগঠিত আকারে গৃহীত হয়নি এবং এতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণও ছিল না। ফলে বহু আগে গণশিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা ঘটলেও এসব উদ্যোগ সঙ্গত কারণে শিক্ষার বা সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে কোন প্রভাব ফেলেনি। ফলে সাক্ষরতা সংকট দেশের সর্বক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। এ নীতির পঞ্চম অধ্যায়ের 'খ' ধারাতে শিশু শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ ধারার ৩ ও ৪ নং উপধারাতে বলা হয়েছে—

৩) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৪) স্কুলত্যাগী বিশেষত ভর্তি না হতে পারা মেয়ে শিশুদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযুক্ত ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।

এছাড়াও আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। সময়ের দাবি এবং সাংবিধানিক অঙ্গীকার রক্ষার নিমিত্তে বাংলাদেশ 'সবার জন্য শিক্ষা' জমতিয়েন ঘোষণার স্লোগানকে ১৯৯০ সাল থেকে তাৎপর্যের সঙ্গে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং সেই হিসেবে সাক্ষরতা কর্মসূচি এগিয়ে চলে। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার একটা সম্মানজনক স্থানে উন্নীত হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সাক্ষরতার হারের একটা তারতম্য দেখা দিলেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মহলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ অন্য চারটি দেশ যথা— চাদ, ফ্রান্স, মিসর ও উরুগুয়ের সঙ্গে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে। এই পুরস্কারের মূল্যমান ১৫ হাজার মার্কিন ডলার। সে সময় সাক্ষরতার ক্ষেত্রে একটা গতির সঞ্চার হয়েছিল। এখন সেই গতি আর গতিশীল নেই। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, পুরস্কার পাওয়াটাই কি সাক্ষরতার শেষ কথা? যাই হোক, এবারকার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রাণকথা— শিক্ষা আনে কল্যাণ, সুখ স্বাস্থ্য অফুরান। যাক কর্মসূচির গতিই নির্ধারণ করবে কতটুকু কল্যাণকর এবং কতটুকু অফুরান।

শাওয়াল খান : *শিক্ষা গবেষক*